Baby's Day Out...

লেখকঃ কৌস্তুভ অধিকারী
যোগাযোগঃ kaustubh.adhikari@gmail.com
পরিচিতিঃ কৌস্তুভ কিছুদিন হল কলকাতা ছেড়েছেন Biostatistics নিয়ে PhD করতে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে। মাতৃভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অবসর সময়ে ব্লগ, কলকাতা বোর্ড এবং পালকির জন্য লেখালিখি করেন। এছাড়া পছন্দ করেন গান শুনতে, বেড়াতে, রান্না করতে আর প্রেম না করতে।

(১)

...আমার বিদেশ যাত্রা তো বাড়ির লোকের চোখে এর থেকে বেশি কিছু নয়। এখনো তাদের ধারণা, তাদের খোকা বোস্টনের রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়; আর বাছা দৈনন্দিন ডুডু ঠিকমত খেতে পারে কিনা তাই নিয়েই তারা চিন্তায় থাকে। তামাকু-টা যে খায়না সেটা জানে অবশ্য।
আবার অন্যদিকে স্যানা লোকজন জানে, কোনো ছোকরা ইদিকপানে এলে দুদিনে তালেবর হয়ে যেতে বাধ্য – তাই বিশেষত যে বন্ধুবর্গ এখনো হেথায় আসার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়নি, তারা নিয়মিত খুঁচিয়ে থাকে, কিরে, কতটা দেখলি? কতটা কাপড় কম পরে? দূর হতভাগা, স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছিস, মেপে বলতে পারলি না?

কিন্তু, আমাকে তো লিখতে হবে প্রথম আমেরিকা এসে আমার ভাবনাচিন্তা। দেশে লোকজন কি বলে তাই নিয়ে বেশি লিখলে সম্পাদক তেড়ে আসবে। আর মুশকিল সেখানেই, কি দেখনু সেটা গুছিয়ে লেখা। ঠিক সেইজন্যই, 'এলেম নতুন দেশে' এই টাইটেলটা পরিহার করা সমীচীন। প্রথমত, কিঞ্চিৎ ক্লিশে হয়ে যেত – আমার মতন যে বন্ধুরা এলো তারাও সবাই এটা খুব ব্যবহার করছে। অবশ্য করবে নাই বা কেন – রবিবাবু (আমার গৃহশিক্ষিকার দ্বিবর্ষীয় সন্তান এনার ছবি প্রথমবার দেখে একটা চমৎকার নাম দিয়েছিল – দাড়িদাদু) তো আমাদের যত রকম ভাব হতে পারে সবই লিস্টি করে গেছেন তাঁর গান আর কবিতার মধ্যে। আমিও গণ্ডাকয়েক ব্যবহার করব বইকি। দ্বিতীয়ত, ওটা লিখলেই সবাই চেপে ধরবে, ভাল করে বল নতুন কি দেখলি। সেই তো কেচ্ছা। এখানে তো বেসিক ব্যাপারস্যাপার কিছুই পাল্টায়নি। বাড়িঘরগুলোও আকাশে ঝোলে না, কেউ আকাশে উড়ে উড়েও চলেনা, আবার কারুর চারটে করে হাতও নেই (অবশ্য আমি যে পরিমাণ 'বাঁদর' গালি শুনে থাকি সেটা ধরলে আমার আছে, কিন্তু আমি তো এদেশি নই)। 'নিকাশরঞ্জন' খুশি হবেন দেখে, বৃষ্টিতে এখানেও কিছু জল জমে, রাস্তায় গর্তও আছে, জ্যামও হয়, মাল খেয়ে টাল হয়ে পড়ে থাকা লাল গাল মাতালও আছে, ভিখারিও আছে (তারা আবার 'চেঞ্জ, চেঞ্জ' বলে ভিক্ষা চায়, প্রথমদিন ভেবেছিলাম, এদেশে তো খুচরোকে চেঞ্জ বলে, বুঝি নোট দিলে ভাঙিয়ে দেয়)। উল্টো দিকে, অনেক কিছুতেই আবার অনেক তফাত আছে। প্রধান তফাত হল, বেটাদের সব কিছুই উল্টো। গাড়ি চলবে রাস্তার উলটো দিকে, আলোর সুইচ টিপে বেকুব হতে হবে, প্রথম বার কল খুলতে গেলে জামাকাপড় ভেজা অবধারিত, যখন সারা দুনিয়া সেন্টিগ্রেড আর কিলোমিটার মাপে এরা ফারেনহাইট আর মাইলে পড়ে আছে। সব মিলিয়ে আমার মতন কেবলরামের পক্ষে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। নিজে যখন গুছিয়ে কিছু বলতে পারলাম না, তখন অন্যান্য বিদেশী বন্ধুবান্ধবদের শরণাপন্ন হলাম। তা সবাই এক গোয়ালেরই গরু তো, কেউই পষ্ট করে কইতে পারে না। একজন বলল, এখানে বড় পিএনপিসি চলে; একজন দুঃখ করছিল, কারুর সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গতা হয়না; এক বান্ধবী'র মত, সবকিছুই 'বড় বড়' (কেউ কু-অর্থ করবেন না দয়া করে); তবে এক চতুরা ভাল বলেছে – লাইফস্টাইল-ই আলাদা, বিশদে জানতে হলে হলিউডি দ্রব্য পশ্য।

এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে – বান্ধবী'র ইংরাজি কেন গার্লফ্রেন্ড হবেনা? পিরিতের লোককেই কেন বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড বলে? তাহলে বন্ধুদের মধ্যে যারা ছেলে কি মেয়ে তাদের কি বলবে? এটা একদিন কোন এদেশিকে শুধিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু এটা বুঝলাম, এখানে প্রায় সবারই সেইরকম ইস্পেশাল ফ্রেন্ড আছে – না থাকাটার অর্থ হল সদ্য

কারো সঙ্গে ব্রেক-আপ হয়েছে। আমার মত ঝাড়া-হাত-পা লোক এখানে নিম্নশ্রেণীভুক্ত। কোন আড্ডায় যখনই কথা ওই দিকে যায়, সবাই প্রচুর কিচিরমিচির করে; আমি কেবল চুপ করে শুনি, পরে কোথাও এ গল্প চালিয়ে দেব এই আশায়। শুনে-টুনে এই সিদ্ধান্ত করলাম, যে এদেশি হোক বা বিদেশি, মেয়ে হলে তারা স্বদেশি দ্রব্য পছন্দ করে। কিন্তু ছেলে হলে প্রায়ই তারা বিদেশি মাল চায় – অর্থাৎ বাইরে থেকে এলে মেম ধরতে চায় আর এখানকার হলে বাইরের মেয়েদের দিকে নেকনজর দেয়। তবে গ্রাজুয়েট স্কুলে এসবের সম্ভাবনা কম, কারণ এতদিনে প্রায় সবারই কিছু জুটে গেছে। অন্যদিকে এটাও সত্যি, যে আমাদের দেশে যেমন ছেলের মেয়েবন্ধু বা উল্টোটা হলেই, লোকে ধরে নেয় কিছু ইন্টুমিন্টু চলবে, আর প্রায়ই চলেও থাকে, এখানে সেসব ল্যাঠা নেই। সেই নিরাপত্তা দেখেই এখানে কয়েকটি বান্ধবী (অবশ্য এনগেজড দেখে নিয়েই) বানাবারও সাহস করেছি, হে হে...

তেমনি এক দেশ-প্রেমিক ইজরায়েলি বান্ধবীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সেদেশে দুবছর মিলিটারি সার্ভিস বাধ্যতামূলক, আর সে নাকি ভাল লাগত বলে পাঁচ বচ্ছর কাজ করে এমনকি F-1 ও উড়িয়ে এসেছে। এখন তার বক্তব্য, ছাব্বিশ বয়স হয়ে গেল, এবার শীঘ্র বিয়ে আর বাচ্চা চাই; বেশি বয়সে বাচ্চা হলে তার স্বাস্থ্য ভাল হয়না। কথাটায় যুক্তি আছে; আর হাজার হোক, মায়ের জাত তো। তারপর তার বয়ফ্রেন্ডের গুণকীর্তন করতে লেগে গেল, তবে হবু শ্বশুরবাড়ির কথাই বেশি। সুন্দর পরিবেশ, কি মধুর ব্যবহার, কেমন আপন করে নেওয়া, ইত্যাদি। আমি আকাট, বলে ফেললাম, তোমার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির প্রশংসা করছ, ভাল কথা। দুঃখ করে বলল, কি করব, নিজের বাড়িতে কোনদিন এমন পেলাম কই? ছোটবেলা থেকেই দেখি, বাড়িতে বাবা-মার ঝগড়া, কদিন পরে ডিভোর্সই হয়ে গেল। পরিবার কাকে বলে জানব কি করে? স্নেহ আর পেলাম কবে? নিজেকে মনে মনে খুব বকলাম এ নিয়ে খোঁচাবার জন্য; আর এটাও দেখলাম, দেশ যাই হোক, মানুষ যাই হোক, 'এতটুকু বাসা'র বাসনাটুকু থেকেই যায়।

যাহোক, যা কথা হচ্ছিল। আমি বিরাট কিছু দেখবার আশা করে আসিনি, 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' বলতে বলতে প্লেন থেকে নামিনি, যেমন এদেশও আমার জন্য 'এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি' বলে বসে নেই। ঠিক কি ভাবে বসে আছে, টের পেলাম ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। এক হাঁড়িমুখো সায়েব আমার কাগজপত্র দেখে বিশ্রী accent-এ বলল, Welcome to the US. আমি মিষ্টি করে বললাম, থ্যাঙ্কু। দেখি চটে গেল! তেড়ে মেড়ে বলল, I asked, why're you to the us? তাই বল, ঢোকার পারমিশন দেবার আগেই কেন স্বাগত জানাবে, আর তাহলে হাঁড়িপানা মুখই বা হবে কেন। তবে কিনা আমেরিকানদের মৌখিক ভদ্রতাটা বেশ আছে, তাই ভেবেছিলাম... এই যেমন দেখুন, আমরা এখানে বাস থেকে নামার সময় প্রায়ই ড্রাইভারকে 'বাই' বা 'থ্যাঙ্কিউ' বলে নামি; একবার ভাবুন, কলকাতায় যারা 'ওরে হারামজাদা সিগনালটা খেলি তো' বা 'কি হল আর কত লোক তুলবি তোদের খাঁই কি আর মেটে না' শুনেই অভ্যস্ত, তারা এমন যদি কোনদিন শোনে হার্টফেল করবে কি না।

(২)

কলকাতা এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাস ধরিয়ে "জানেনই তো..." বলে শুরু করে লুফ্‌ত্‌হান্‌সা'র সুবেশী কর্মচারিনী যা ভয়ঙ্কর কথা বলল, প্রথমে শুনে উপলব্ধিই করা যায়নি, ভাবলাম ভুল শুনছি; আবার জিজ্ঞেস করতে হৃদয়ঙ্গম হল। ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট-এ কর্মচারী ধর্মঘট চলছে, বহু প্লেন ক্যানসেল, আমারটাও হলে যেন আশ্চর্য না হই; দিন-চারেকের মধ্যেই কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন ওনারা দয়া করে। কিন্তু আমাকে যে যেদিন পৌঁছব তার পরের দিনই রুম ফি জমা দিতে হবে, নইলে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা ক্যানসেল হয়ে যাবে, তার কি হবে? ওদেরকে শোনাব এমন কোন উদ্দেশ্য ছিল না, খবরটা শুনে আপনিই আর্তনাদটা বেরিয়ে এল। উত্তরে একটা মিষ্টি ছোট্ট সরি ছাড়া আর কি বা আশা করা যায়। হাওড়া স্টেশনে যেমন বেঘর-দের রাত কাটাতে দেখি, ফ্রাঙ্কফুর্টে এয়ারপোর্টে আমাকেও তেমন থাকতে হবে এই ভাবনা নিয়েই প্লেন এ উঠলাম।

যারা কখনো প্লেন-এ চাপেনি তারা অনেক স্বপ্ন দেখে – কিন্তু বাস্তবে যেকোনো প্লেনের থেকে ট্রেনে বসা অনেক আরামের। যেমন হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়, উঠে হাঁটাচলা যায়, প্লেনে তার কোন সুযোগ নেই। আর ট্রেনে ঘুমোবার

সময় তো আস্ত একটা বিছানাই আমার; কিন্তু প্লেনে ওই সিটটাকে অল্প হেলিয়ে নাক অবধি চাদর টেনে (যখন প্লেন ৩০ হাজার ফুট উঁচুতে, বাইরে -৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, তখন চাদরেও বেশ শীত করে অবশ্য) কিছুতেই ভাল ঘুম হয়না। ভাগ্য ভাল, প্লেনকে বাতাসের পকেটস্থ হতে হয় নি, তাহলে তো আরো...। তবে সব অনুযোগ অভিযোগ মিটে গেল যখন, ট্রেনে সূর্যোদয় দেখতে ভাল লাগত বলে, ভোরবেলা জানলা খুলে দেখি, হঠাৎ কমলা রঙের আলোয় ভরে গেল আমার পাশটা। দিগন্ত জুড়ে গাঢ় কমলা রঙের রেখা, উপরে আর নীচে গাঢ় নীল আকাশ আর জমি, আর অস্বাভাবিক বড় লাল সূর্যের চারদিকে কমলা-হলুদ-গোলাপীর খেলা। কুয়াশার জন্য খানিক দূর থেকে আর জমি বোঝা যায়না, একই রঙের আবছা-অন্ধকার আকাশের সঙ্গে মিশে যায়; তাই দিগন্ত বলে যা মনে হয় তার চেয়ে আসল দিগন্ত অনেক উপরে। সূর্যোদয়ও তাই মনে হয় যেন মাঝ-আকাশে হচ্ছে। আমার দেখাদেখি অনেকেই জানলা খুলে ফেলল, এক অদ্ভুত মায়াবী আলোয় ভাসল প্লেনের ভেতরটা।

এসে তো পৌঁছলাম, এবার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের কথা বলতে হয়। এখানকার ইস্টাইল ধরা আমার মতন গাঁইয়ার আর হলনা; বস্ত্র এখনো দেশের মতই চালাচ্ছি। যেমন প্রথম টাকার চেক আনতে ডাক পেয়ে ঘরের ফতুয়া আর পাজামা পরেই ছুটেছিলাম। আনন্দের কথা এখানকার রাস্তায় কুকুর-টুকুর নেইকো। শুনে অনেকে জ্ঞান-ট্যান দিলো, এভাবে দেশের সম্মানহানি করিসনা। আরে, রাস্তায় যে লোকে খালিগায়ে হাফপ্যান্ট পরে ছোটাছুটি করছে, তার বেলা? আর সুইমিং পুলে মেন'স চেঞ্জিং রুমে গিয়ে তো দেখি, চারিদিকে সব 'নেংটা গোরা' ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমারই কেমন অস্বস্তি লাগছিল। এক ক্যাবলা বন্ধু শুনে জিগাল, হ্যাঁ রে, পুলে কাপড় পরে তো? বললাম, দূর বোকা, কমন পুল তো। বলে কিনা, তাহলে তো নাহলেই ভাল তো... বুঝুন অবস্থা! সব দেশোয়ালি ফ্রাস্টু পাবলিক!

বাসস্থান বেশি কিছু বলব না, হোস্টেলে আছি; তবে দেশের যেকোনো হোস্টেলের থেকে অনেক ভাল, বড়, ফার্নিশ্‌ড্ ঘর। তাও আবার ষাট বছরের বেশি পুরোনো – দেশে হলে তো ভেঙ্গেচুরে যেত। তাও ধরুন, এটা হল বাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঘরওয়ালা। বড় ঘরের বাড়িগুলো শতাধিক বৃদ্ধ। দ্যাশে অনেক জায়গা ঘুরে এবং অনেকের মত নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলাম, যে এমন কোনো হোস্টেল নেই যার খাবার ভালো। আর এখানে তো বেশ ভালোই খেতে দেয়, অনেক রকম পদও থাকে। অগ্নিমূল্য অবশ্য।

এই দেখুন, সেই খাবারের কথায় চলে এলাম। Defer করে রেখেছিলাম, কিন্তু কি করি, ঔদরিক বঙ্গজীব। মুজতবা আলি সেই পেটুক ছোঁড়ার কথা লিখে গেছেন, যে সব কিছুতেই খ্যাঁটের কথা টেনে আনে, এমনকি শতকিয়া পড়তে দিলেও – একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ, মাগ, ছেলে-পিলে, জ্বর, সর্দি, কাশী, গয়া, পুরী, কচুরি, রসগোল্লা, সন্দেশ... আমার সেই অবস্থা। নইলে কে বলুন তো সেই দুধ কিনে আনা ইস্তক চার ঘন্টা খেটে ১৫টা রসগোল্লা বানায় স্রেফ শখের বসে! তাও কিনা যে আসার এক মাস আগেও ভাত করতেও জানত না। এখন তো আমাদের ফ্লোরে আমার রন্ধন সুখ্যাত; যখন সবাই পাস্তা কি সিরিয়াল দিয়েই উদরপূর্তি সারে, আমায় মন-দোলানো গন্ধওয়ালা 'ইন্ডিয়ান কুরি' কি 'চ্যাপ্‌টি' নির্মাণ করতে দেখে তো, তাই। সেদিন এদেশি আম কিনে বেকুব হয়ে গেলুম, বাইরে সুন্দর লাল হলে কি হবে, ভেতরে পুরো কাঁচা। কি করি, চাটনি করে ফেললাম। খাসা গন্ধ ছড়াচ্ছিল, লোকজন জিজ্ঞাসিল, এটা কি। কি করে বোঝাই, বললাম 'ম্যাঙ্গো স্যুপ'। 'তাই নাকি', 'চেখে দেখি', 'ওমা মিষ্টি মিষ্টি স্যুপ', 'আম দিয়ে এ জিনিস কি করে হয়', 'ইন্ডিয়ান আম নাকি' বলতে বলতে সব কপাকপ মেরে দিল।

এখানে দেখি সবাই খুব ক্যালরি সচেতন; তাও কি করে যে ৩০% লোক হাতিমার্কা চর্বিগোলক হয়ে ফেরে জানিনা – তাদের ছবি যদি দেশে যাদের মোটা বলে খ্যাপাতাম তাদের দেখাই তো নিজেদের পাটকাঠিসম মনে করে তারা আমায় জাবড়ে ধরে চুমো খাবে। আমি অবশ্য পেলেই খাই, আর এদেশের খাদ্যে তো স্বাদ বেশি নেই, তাই একটু মিষ্টদ্রব্যের প্রতি পক্ষপাত করি। ফলে,

খালি পেটে বার্গার ঢুকে কেবল বেড়ে যাচ্ছে ভুঁড়ি;
এখন কুকিস্ ছাড়া দিন চলেনা, বরং প্যাস্ট্রি পেলে খেতে পারি।

এই যেমন ধরুন, সেদিন কলেজ থেকে উভচর শকটে করে বোস্টন শহর দেখাতে নিয়ে গেল। তা একটু গিয়েই হুঁশ হল, মানিব্যাগটি এখনো ঘরের টেবিলে বিরাজমান! এদেশে হাতে কাঁচা টাকা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্ড মায় ট্রান্সপোর্ট কার্ডও তো সেটায়! যাহোক, আমার নিজের এগারো নম্বর বাস অর্থাৎ ঠ্যাংজোড়া তো আছে, তাতে করেই ফিরব। তাই ট্যুরের শেষে যখন হার্ড রক কাফেতে খাইয়ে কর্মকর্তারা বিদায় দিল, তার আগে নিজেকে বললাম, বাপধন, যা কাণ্ড করেছ তাতে তো কপালে মাইলপাঁচেক হাঁটা আছে, ভাল করে পেটে রসদ নিয়ে নাও। তারপর হাঁটা শুরু করলাম। একটু পরেই...

হার্ড রক-এ খুব সাঁটিয়ে ভরা পেট যে বড় ভারি;
চরণ যে মা আর চলেনা বিনা একখান মোটরগাড়ি।

কিন্তু দাদাঠাকুর যেমন রাজা হতে পারেননি, তেমন আমার এ ছ্যাবলামিও মা শুনলেন না। তবে কি, এটারও একটা ভাল দিক ছিল। গাড়িতে চলার সময় তো হুশ হুশ করে সব ল্যান্ডমার্কগুলোর পাশ দিয়ে চলে গেছিলাম, এবার ভাল করে চারদিক ঘুরে দেখলাম, একদিনেই তিনশ ছবি তোলা হয়ে গেল। জীবনের প্রথম স্কাইস্ক্র্যাপার খাড়া দেওয়ালের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে তলা থেকে দেখে এক্কেবারে মাথা ঝিমঝিম।

বিদেশে না এলে দেশের সেন্সর বোর্ডের প্রয়োজনও বোঝা যায় না। যেমন আমি বাড়িতে এই দুষ্কর্মটি চেপে রেখেছিলাম, কারণ একাধারে প্রচুর (অপর্যাপ্ত শব্দটিকে যদিও অনেকেই প্রচুর অর্থে ব্যবহার করেন, তার আসল মানে কিন্তু ‘পর্যাপ্ত নয়’ মানে কম, অপ্রতুল; বিশ্বাস না হলে হরিচরণবাবুর অভিধান দেখে নেবেন) বকা খেতে হবে; কিন্তু সেটাই আসল কারণ নয়, এই কষ্টের কথা ভেবে জননী ‘নয়ান ভাসিল জলে’ হবেন, সেটাই বেদনা। বঙ্কিমবাবু থেকে ভানুবাবু সবাই বলে গেছেন, মেয়েরা অমন ছোট দুখানি চোখের মধ্যে কী করে আস্ত দমকল লুকিয়ে রাখে বোঝা দায়। আর আমি বলি, চিরদিনই ভারতে সেন্টুমার্কা সিনেমার চল, তাই বৃষ্টিজল সংরক্ষণের মত সিনেমাহল গুলোয় চোখের জল সংরক্ষণ করা হলেও অনেক লাভ হবে।

শিবরাম বলেছেন, আমরা বীর বঙ্গসন্তান, শুধু নাপিতের কাছে মাথা নোয়াই, ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে পড়ি, আর জ্যোতিষীর কাছে হাত পাতি। আর এখানে মাথা নোয়াতে টিপস সমেত রোক্কা বিশটি ডলার ব্যয়। যেখানে কলকাতায় ইটালিয়ান সেলুনে দশ টাকায় হয়ে যেত। মানে আশিগুণ খরচ। তাই বলি

টাকা নাহয় না দিলি মা, টাক দে না মা কপাল জুড়ি –
প্রতি মাসে বাঁচবে তা’লে কম করে মা ডলার কুড়ি।

যদি বাঙ্গালিচরিতের কথাই উঠলো, তাহলে একটা প্রশ্ন করি। কবিগুরু লিখেছেন,
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর নি।
তা এটা মোটামুটি সর্বজনসম্মত যে আজকাল মনুষ্যত্ব আরো কমে চলেছে; আবার বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব হারানো নিয়েও চিন্তার অন্ত নেই। তাহলে, বাকিটা গেল কোথায়? পাশ্চাত্যানুগত্য? নাকি CERN-এ উৎপন্ন কৃষ্ণগহ্বরের কোনো ষড়যন্ত্র আছে?

(৩)

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কলকাতা শহরের থেকেও পুরোনো। অর্থাৎ জব চার্নকের আগেই জন হার্ভার্ড কাম সারসেন; তাই তার পুরষ্কারস্বরুপ নিত্যি নিত্যি ফ্রী-তে বুট-পালিশ পেয়ে থাকেন। পরিষ্কার করে বলি। ক্যাম্পাসে এক ধারে এক বেদীর উপর মর্মরনির্মিত হার্ভাড নিয়মিত মব্‌ড্ হয়ে থাকেন – জনশ্রুতি যে তাঁর জুতো ছুঁয়ে পরীক্ষাতরণী পার হবার সুবিধা হয়, তাই জুতোর ডগা খামচে বা বেদী জড়িয়ে ছবি তোলা চলে দলে দলে ট্যুরিস্টদের, ঠিক যেমন পৃথুলা সর্দারনী লালকেল্লায় তখ্‌ত্-এ-তাউসে বসে হাসিমুখে পোজ দেন। এনাদের অনেকে জানেনও না, এ মূর্তিটি ‘স্ট্যাচু অফ থ্রি

লাইজ্’ বলে খ্যাত – প্রথমত, স্থাপনের সাল ভুল লেখা, দ্বিতীয়ত, তিনি মোটেও ‘ফাউন্ডার’ নন, শাঁসালো ডোনার ছিলেন বলে তাঁর নামে নাম (কেন শুধু কলকাতার প্রাইভেট স্কুলদের দোষ দেওয়া), আর সবচে’ বড় কথা, এটা তাঁর প্রতিকৃতিই নয় – কোন পোর্ট্রেট ছিলনা বলে এক স্টুডেন্টকে মডেল করে বানানো! ভাল কথা, জড়ানোর ঠেলায় ঘষা খেয়ে ইতিমধ্যেই প্রথম লেখাটা উঠে গেছে, বাকিগুলোও জলদি গেলে আপদ যায়।

প্রাচীনত্ব, বিশালতা, অর্থ আর খ্যাতি মিলিয়ে হার্ভার্ড অনন্য – তাই অনেকটা স্নবও বটে। চাপ-ও অনন্ত। তার ঠেলায় ঘুমের সময় অর্ধেক হয়ে গেছে, খাবার সময় মেলে না মাঝেমধ্যেই, আর বিজয়ার প্রণাম জানানোও তাই পিছিয়ে weekend-এ চলে গেল। এর মাঝে আবার, যেহেতু সদ্য বিদেশগামী হয়েছি, দিনে দিনে ফোন না করতে পারায় আত্মীয়স্বজনদের সেন্টু শুরু হয়ে গেছে, ছেলে বিদেশে গিয়েই আমাদের ভুলে গেল...। তবে, পরিবেশটা ভাল। কংক্রিটের জঙ্গল নেই, সুন্দর মাঠ আছে, তাতে বসে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করতে করতে গায়ে আলতো করে লাল ম্যাপল পাতা ছুঁয়ে বয়ে যায়; একবার চোখ তুলে তাকাই হলুদ-সবুজ-লাল পাতার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশে, যেখানে ছোট ছোট সাদা নকশা আঁকা; দুবার তাজা বাতাস নিয়ে আবার কাজে মন দি। আর অন্যান্য জায়গায় ‘কালোমামা’ (কৃষ্ণাঙ্গ গুন্ডা)-দের ঝামেলা থাকলেও এখানে তেমন নেই। কিন্তু সে দিন ভুল করে অনেক দূরে একটু ‘shady’ নিরিবিলি জায়গায় একা চলে গেছিলাম। হঠাৎ শুনি ‘gimme your wallet’; চেয়ে দেখি, কালো নয়, মামা নয়, নিতান্ত এক সাদা খোকা, রোগাপ্যাংলা teen। ভাবলাম বলি, চাঁদু, ঝামেলা কোরো না, ক্যারাটে’র প্যাঁচে দুমিনিটে পটকে দেব। তারপর ভয় হল, আমেরিকা একুশে আইনের দেশ বটে। এখানে খালি বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে আটকে পড়া চোর গৃহস্থের বিরুদ্ধে মামলা জেতে, এখানে রেললাইনে নুন ঢাললে ফাঁসি হয়, কি জানি যদি শেষে আমায় threat করার দায়ে sue করে? দরকার নেই বাবা, পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

যা বলছিলাম। হার্ভার্ডের অনন্যতার একটা বড় উদাহরণ হল তার মিউজিয়াম। এদের সংগ্রহ এত বড় যে আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা সংগ্রহশালা করতে হয়েছে, যেমন কলা, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। এখানকার ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম বিখ্যাত দুটি কারণে। প্রথম হল এর স্টাফ-করা জন্তুর সংগ্রহ, কলকাতা মিউজিয়ামের মতন একটা বাড়ি কেবল এতেই ভরা। সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় থেকে সবচেয়ে ছোট জীব-জন্তু-পাখি দেখা যায়। আর যারা এখন ভারত থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন গোলাপি-মাথার হাঁস, হিমালয়ান কোয়েল, তারাও এখানে তাদের একদা অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

তা তো হল, কিন্তু বোটানি পড়াতে যে গাছপালা লাগে, তাদের তো স্টাফ করা যায়না। আর এ সমস্যা যখন একশ বছর আগে এক প্রফেসারের মনে এসেছিল, তখন রঙিন ছবিও ছিলনা। সে সময়ে যে রূপদক্ষ এর অসাধারণ এক সমাধান দেন, তিনি হলেন লিওপোল্ড ব্লাশ্‌কা। তিনি কাচ দিয়ে, হ্যাঁ, কাচ দিয়ে (কথাটা কাঁচ নয়, ওটা ঘটিদের বদভ্যাস), ঘাসের শিকড় থেকে অর্কিডের ফুল, জাফরানের রেণু থেকে ঝরা ম্যাপল পাতা, এমন আটশ রকমের গাছপালা বানান, তাঁর ছেলের সঙ্গে মিলে। আর তাঁদের দক্ষতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, বহু লোকে ঘুরে দেখে বেরিয়ে যাবার সময় প্রশ্ন করে, ‘কই, কাচের ফুলফল তো দেখলাম না?’ দুঃখের কথা, তাঁর ছেলে রুড্‌ল্‌ফ্ বিয়েও করেন নি, আর কাউকে এ বিদ্যা শিখিয়েও যান নি; তাই তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত গ্লাস আর্টিস্ট চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় এ শিল্প এখন অবলুপ্ত।

(৪)

শিল্পের কথা যদি উঠল, তাহলে বাঙ্গালির বৃহত্তম শিল্পের কথা কিছু বলতেই হয়, বিশেষত এই সময়। হ্যাঁ, দুর্গাপুজোর কথাই বলছি। এটা সত্যিই শিল্প, আর্ট অর্থেও, আর ইন্ডাস্ট্রি অর্থেও। তাই শারদীয়া হল হুজুগে বাঙ্গালির আর্ট-এক্সিবিশন দেখে বেড়াবার উৎসব। এর সঙ্গে নন্দনে ফিল্মোৎসব দেখে বেড়াবার মূলগত তফাত খুব কম – দল বেঁধে যাও, ভিড় ঠেলে ঢোকো, একটা শো দেখেই তাড়াহুড়ো করে পরেরটা দেখার জন্য দৌড়ও। ফারাক একটাই, ওখানে নিজেকে দেখাবার প্রেরণাটা থাকেনা, আর পুজো নিজেকে দেখাবার এবং অন্যদের দেখবার একটা বড় সুযোগ। বাস্তবিক পুজো জিনিসটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার তো কোন দরকার নেই। ভেবে দেখুন, বারোয়ারি পুজোর একটা বিশাল দালান,

দশ হাত উঁচু মা দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ, চারদিক শান্ত, এক ধার দিয়ে সকালের মিঠে রোদ্দুর এসে পড়ছে, ঝরা শিউলি আর টগরের হালকা গন্ধ, এক ধারে মাফলার-জড়ানো বৃদ্ধের দল আর অন্যদিকে ছেলেছোকরারা জটলা করছে, ভোর-ভোর চান করে বাচ্চাগুলো দুটো নাড়ুর জন্য প্রসাদের আশপাশে ঘুরঘুর করছে, লাল শাড়ি পরা মা-মাসিমার দল অল্প ধমক দিচ্ছেন, এই পরিপূর্ণ ছবির সঙ্গে শ্রীভূমি কি বাগবাজারের দশহাজারি ভীড়ের কোন সম্পর্ক আছে?

আচ্ছা, পুজোয় কে কিভাবে আনন্দ-ফুর্তি করল তাতে কি আসে যায় রে? পুজো তো পুজোই রইল? তা রইল তো বটেই, শুধু খোল-নলচে-কলকে-টিকে পালটে গেছে। আনন্দ করার ধরনটাও। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে রামপুরহাট মামারবাড়ি যেতাম পুজোয়। কখন দাদুর হাত ধরে রথতলায় আমার চেয়ে বহুগুণ বড় ওই ঠাকুরটা দেখতে যাব, কখন মা-দিদা মিলে নাড়ু পাকাবে আর আমি একটা-দুটো চাখতে পাব মিষ্টি ঠিক হল কিনা দেখার অছিলায়, তারপর আমারই জন্য বানানো ওই ফুলতোলা আসনটায় বসে সেগুলো পেটে পুরবো, সারা দুপুর ধরে সেখানকার বন্ধুবান্ধবীদের সাথে পাড়া জুড়ে লুকোচুরি খেলে বেড়াব আর নুন মাখিয়ে বুনো কুল খাব, সেই ভেবে একমাস আগে থেকে ইস্কুলে মন বসত না। ট্রেনে যাবার সাত ঘন্টা আর ফুরোতেই চাইত না, কিন্তু ছুটির চারটে দিন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেত। চলে আসার সময় যখন ভোরবেলা আলো না ফুটতেই বাবা ডেকে তুলত, তখন মনে হত, কি দরকার বাড়ি যাবার, আমার ইস্কুল আর মায়ের অফিস দুদিন কামাই করলেই তো হয়, তাহলেই তো বিদায়ী প্রণামের সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দিদাকে অন্ধকারে চোখের জল লুকোতে হয় না। এবার বলুন তো, আজকের কলকাতায় কেউ পারবেন সেই চারটে দিন ফিরিয়ে দিতে?

কিন্তু আমি যখন বিদেশে, তখন প্রবাসীদের পুজোর কথাও কিছু বলতে হয়। আমার মতন তাঁরাও চান সেই চারটে দিনে ফিরে যেতে। কিন্তু আমার মতন অত বায়নাক্কা তো তাঁদের নেই, কলকাতার মতন একটা পুজো-পুজো খেলা সাজিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করতে পারলেই তাঁদের চলবে। তার উদাহরণ তো এবারে সুব্রতবাবুর লেখায় পেয়েইছেন। আমি আরেকটা যোগ করি। গেলবার দুই বন্ধু ঠিক করেছিল, এক ঘন্টা দূরের পুজো তো, একজন শনি আর অন্যজন রবিবার গিয়ে দেখে আসবে। প্রথমজন ঘুরে এসে বলল, যদি প্রবল ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বাঁচতে চাস, তাহলে ডলার গাঁটগচ্চা দিয়ে যাসনে। পুজোর মন্ত্র হল হরিবোল, আর দৈনিক পুজো শেষ হয় সমবেত হাততালি দিয়ে।

নাঃ, বাঙ্গালির অনেক নিন্দা করে ফেলেছি। কিছু ভাল কথা বলা যাক। এটা মানব, বিদেশে বাঙ্গালিই বাঙ্গালির সবচেয়ে বড় বন্ধু। প্রথমবার এয়ারপোর্টে ঢুকে হাবার মতন চেয়ে আছি, ডানদিকের লাইনে আগে দাঁড়াতে হয় কি বাঁদিকের ঠাহর করতে পারছি না, এক দিদি দয়া করে এসে বুঝিয়ে দিলেন। এমনকি প্লেনে তাঁর সিট অনেক দূরে ছিল বলে আগেভাগেই কায়দাকানুন শিখিয়ে দিলেন কি করতে হবে। তাঁরই দৌলতে এক প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা হল যাঁরাও বোস্টন আসবেন, একই প্লেন ধরবেন ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে। সেটা বিশেষ ভাগ্যের কথা ছিল, কারণ ফ্রাঙ্কফুর্টে দেখি ফোনবুথ আমার ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড নিচ্ছেনা, এদিকে বাড়িতে আশা+চিন্তা করে বসে আছে। তাঁরাই তাঁদের কলিং কার্ড থেকে ফোন করিয়ে দিলেন।

(৫)

আমি আমেরিকা আসার আগে অনেকেরই চিন্তা ছিল, আমার মেঠো ইংরিজি দিয়ে কাজ চলবে কি না, প্রফেসরদের কথা বুঝতে পারব কিনা। দেখলাম, সমস্যা হচ্ছে, তবে চিনা ইংলিশ, ইটালিয়ান ইংলিশ, ইজরায়েলি ইংলিশ বুঝতে, আমেরিকান ইংলিশ দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। আর তারাও আমার কথা বুঝতে পারে, কেবল আমার নাম ছাড়া। কেউ ‘কৌস্তুভ’ বলতে পারবে এত দুরাশা আমি করিনি, যখন কলকাতাতেই বহু লোক ‘কৌস্তভ’ নামকেই সঠিক বলে জানে। তবে ‘kostov’ শুনে একটু ভয় লেগেছিল, কারণ রাশিয়ানদের সাথে তো এদের সদ্ভাব নেই। তেমনি সুর করা ‘কুউউস্তুভ’ শুনেও চমকেছিলাম। আবার যখন একজন আমার নাম লিখল ‘gustup’ তখনো গুমশো হয়েছিলাম বৈ কি। আমার মতে, ভারত যদি রেটে ইন্ডিয়ান সাপ্লাই করতে চায় এখানে, চিনাদের মত, তাহলে তাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি শেখা দরকার – জানেন কি, চৈনিক প্রাইমারি স্কুলে সব বাচ্চার একটা করে ইংলিশ নাম দেওয়া হয় যাতে বড় হয়ে

ইউরোপ-আমেরিকায় তাদের সুবিধা হয়। আর ফল দেখুন, আজকাল যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই চিনে গিজগিজে – হার্ভার্ডে সবচেয়ে বড় ছাত্র এক্সপোর্টার তারাই। সেখানে ভারত পড়ে আছে সেই ৬-এ, হংকং-এর মত ছোট্ট জায়গারও পরে। তাই এদেশি বন্ধুদের বলি,

যদিও বুশের দেখানো ভারত-জুজুতে মার্কিন-গণ, একশা হইলি ঘামিয়া;
যদিও কঠোর নিরাপত্তার বেড়া'তে তালিবান-দের দিয়াছিস কিছু দমিয়া;
চৈনিক প্ল্যান পারিস নি তো রে বুঝিতে – উচিত নয় তো চুপচাপ বসে থাকা;
ওরে লালমুখো, সঙ্কট তোর ঘোর – চ্যাং-চুং দলে কবে পড়ে যাবি ঢাকা।

এই আধিক্য-আধিপত্যের কারণে অ-চিন international-রা অনেকেই অকারণেই 'Asian'-দের অপছন্দ করেন। না না, আমাদের নয়, এখানে সাধারণভাবে মোঙ্গলয়েড ছাঁচের লোকজনদেরই Asian বলা হয়। শুনে অবাক হয়ে শুধোলাম, তাহলে আমরা কি, আমরাও তো এশিয়াতেই থাকি। উত্তর পেলাম, 'Indian'। সে বটে, কিন্তু তাহলে প্রতিবেশী পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, শ্রীলঙ্কানদের কি বলে? এদের ভূগোলজ্ঞান তো এত বেশি নয় যে সবাইকে তার দেশের নামে ডাকবে। উত্তর যা পেলাম, তা শুনে হাসতে হাসতে পেট ফাটার যোগাড় – সবাই নাকি ইন্ডিয়ান! পাকিস্তানের নেতারা একবার শুনলে হয়, শ্যামু-চাচার সঙ্গে পিরীত তাহলে কিছু কমবে।

ইংরাজি উচ্চারণ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আরো মজার হল NRI-দের দিশি ভাষা উচ্চারণ। আমার ফ্লোর-এ একজন ছিল, সে আবার হার্ভার্ড হিন্দুধর্ম সমিতির প্রেসিডেন্ট। আমাকে ডাকল, আমাদের সমিতিতে যোগ দিতে চাও? জিজ্ঞেস করলাম, কি হয় তাতে? বলল, এই ধার্‌মা নিয়ে আলোচনা। বললাম মনে মনে, ধার করা মা-ই বটে, হিন্দুধর্ম তো তোমার আসল মা হতে পারে না বাপু, আমেরিকানিস্‌ম্‌-ই তোমার আপন। আর এতে অন্যায়েরও কিছু নেই। তবে আমারে ক্ষ্যামা দাও। আরেকদিন পাকড়েছিল, বলে, বীফ খাও না তো? সরল ভাবে প্রশ্ন করলাম, খেলে কি হয়? খানিকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করল, ঘোর অধর্ম হয়! কিন্তু ধার করা মা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? তখন ধর্ম ছেড়ে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হল, বলল, "আসলে কি জান, আমাদের হিন্দুদের শরীর বীফ হজমের উপযুক্ত নয়, শরীরের ক্ষতি হয়।" "ও, কোন জার্নালে বেরিয়েছে?" "না না, খেলে দেখেছি লোকের পেট ছাড়ে, তাই মনে হয়..."। অকাট্য যুক্তি!

এই কচকচি থেকে বাঁচতে মাঝে মাঝেই চলে যাই চার্লস নদীর (নাকি নদ? যদিও যা চওড়া তাতে দেশের একটা দিঘিও হবে না; আর এতে চান করাও বারণ, কারখানার বর্জ্য ফেলে যা হালৎ তাতে নাকি টিটেনাস হতে পারে) ধারে, নিরিবিলি জায়গায় বসে একটু হাওয়া খেতে। কিন্তু নিরিবিলি মানেই যে নির্জন তা নয়। কলকাতার মতনই, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নলবন কি ভিক্টোরিয়া, একটু আড়ালে গেলেই দেখবেন জোড়ায় জোড়ায়... কেন জানিনা, কারণ এদেশে তো প্রকাশ্যে 'making out' সমাজে স্বীকৃত, এবং তাদের জায়গা করে দেওয়াটাই ভদ্রতা, যার ঠেলায় সেদিন পার্কের এক চমৎকার পুকুরধার থেকে চলে আসতে হল; হঠাৎ শুনি পাশে একটা বাচ্চা প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদছে, তাই তাকিয়ে দেখি তার প্র্যামের পাশে দাঁড়িয়ে তার মা-বাবা (না-ই হতে পারে, আমেরিকা যখন) চকাৎ চকাৎ করে কিস্‌ করতে লেগেছে (একটু শিল্পজ্ঞান নেই, কি বিটকেল আওয়াজ, ম্যাগোঃ)।

কিন্তু কথায় কথায় যে টপিক-টার বড় কাছে চলে যাওয়া হয়ে গেছে, সেটার থেকে দূরেই থাকতে হবে। দেশের লোকজন পড়বে, সেন্সর-এর কাঁচি এড়াতে হবে তো। এটুকু বলতে পারি, তা নিয়ে গণ-আড্ডায় মাঝে মাঝে কথা হয়; কিন্তু কথায় আর কাজে তফাত রেখেছি...। এদেশি লোকেদের কোন ছুৎবাই নেই, জীবনের অংশ হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই এসব নিয়ে কথা ওঠে; আবার দেশের কারুর কারুর মত তা নিয়ে মাতামাতিও করে না। বরং কেউ তেমন করলে হাসিঠাট্টাই হয়। যেমন কানাডা'র সিনেমা 'জুনো' নিয়ে এক কানাডিয়ান বলছিল, যখন প্রথম সেটা রিলিজ করল, আমেরিকায় অনেক নিন্দা হয়েছিল, এটা নাকি সরলমতি আমেরিকান বালিকাদের মাথা খাবে। সে প্রতিবাদ করেছিল, একটা বেশ ভাল সিনেমাকে শুধু এই কারণে নিন্দা করা ঠিক নয়; আর তাছাড়া, যাদের কথা হচ্ছে তারা তো স্কুলে থাকতেই পেকে ঝুনো, তাদের মাথা খাবে এমন সাধ্য কার? তা যেদিন এক মার্কিন বন্ধুর সাথে প্রচণ্ড তর্ক করে শুতে

গেল, পরের দিন সকালে উঠেই কাগজে হেডলাইন দেখে, সাতের জন সাতের বছরেরও কমবয়সি মেয়ে ‘এক্সপেরিমেন্ট’ করতে প্রেগনেন্ট হয়েছে! তবে এটা তার বক্তব্যকে সমর্থন করল কি বিরুদ্ধে, ঠাওর করতে পারেনি; তাই সে একবার সেই মেয়েদের শহরটা দেখতে গেছিল, কিছু বোঝা যায় কিনা দেখতে।

যাহোক, নদীর ধারে গেলেই দেখি হিপ-পকেটে আইপড বেঁধে লোকজন শরীরের জন্য দৌড়চ্ছে। আগেই বলেছি, বিয়ার না খেয়েও ছোট্ট একটি ‘beer belly’-র মালিক হয়ে পড়েছি, তাই মোটিভেটেড হয়ে পড়ে আমিও কিছুদিন পাঁইপাঁই ছুটলাম। তারপর খেয়াল করে দেখি, আমার পাশেই এক বর্তুলাকৃতি মধ্যবয়স্ক থপথপিয়ে চলেছেন, তাঁর সঙ্গেই এক দড়িসমা ক্ষীণকায়া ডিগডিগিয়ে দৌড়চ্ছেন। তাঁদের স্বচ্ছন্দগতি দেখে মনে হল, এই কার্যে তাঁরা বেশ প্রাচীন, অর্থাৎ হয় আমার আকৃতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই, নয়ত, আরো ভয়াবহ, এঁদের মতন পরিণতি হবে। বাপ বাপ বলে কেটে পড়লুম।

(৬)

কলকাতাবাসীদের জন্য সঞ্জয়-বৃত্তি করার অনুরোধ ছিল, তাই এটা লিখলাম। পারলাম কিনা জানিনা, সবকিছু বেঁকা চোখে দেখার দুর্নাম আছে তো। প্রবাসীরা তো সবই নিজেরাই দেখেছেন, না পড়লে দোষ দিতে পারি না। আর কতজনকে চটালাম জানিনা; ‘অমৃতং বালভাষিতং’ ধরে গোস্তাকি মাফ করবেন। ভাল থাকবেন।